বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার
মুখপত্র

নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৭৯
দাম : ৫০ পয়সা

● বিজ্ঞান আন্দোলনের সন্ধানে – ২ ● Introducing a Document to be Noted—৭ ● সমাজ ও জীবনবিজ্ঞান—কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন—৯ ● বিজ্ঞানকর্মী আন্দোলন সংবাদ—১১ ● ভারতীয় শিশুদের অপুষ্টি—১৩ ● চিঠিপত্র—১৫

সম্পাদকীয়

আগের তুলনায় এদেশে এখন আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র অনেক প্রসারিত হয়েছে—আয়োজন ও আড়ম্বর বেড়েছে ঢের। তবু সুফল ফলেছে কমই। ভারতবর্ষে শিল্পায়নের ব্যর্থতা, শিল্পে বিদেশী কারিগরীর ব্যাপক প্রাধান্য ও গাঁটছড়া, দেশীয় প্রয়োজনের ভিত্তিতে শিল্পে বিজ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগ না-হওয়া ইত্যাদি হ'ল বিকৃতি ও ব্যাধির নানা চিহ্ন। সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের ভূমিকা প্রায় বন্ধ্যা—যার প্রকাশ নানা মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা-কুসংস্কার ও অদৃষ্টবাদী চিন্তার অস্তিত্বে এবং অলৌকিকতাবিশ্বাসের ও 'বাবা'মুখী ভক্তিবাদের ক্রমবর্ধমান প্রাধান্যে। তথাকথিত 'আলোকপ্রাপ্ত'দেরও ব্যাপক অংশের মধ্যে এ রোগের প্রাদুর্ভাব সংক্রামিত। এ এক দুঃখজনক অথচ অনিবার্য অন্তর্বিরোধ—যার শিকড় প্রোথিত শিক্ষা ও সামাজিক শ্রেণী সম্পর্কের গভীরে।

বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ, বিকৃতি ও ব্যর্থতা দূর করবার জন্যে প্রয়োজন নানাভাবে প্রচার এবং সংগঠন। তাই আমাদের আশু কর্তব্য হল জনসাধারণের গরিষ্ঠ অংশকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত করা, বিজ্ঞানের অসীম ইতিবাচক সম্ভাবনাকে নিজেদের জীবনে প্রয়োগ ও বৃহত্তর ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করার আকাঙ্ক্ষা গড়ে তোলার মত একটা মানসিকতা ও পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা। এ সবই হবে একটা দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলনের অংশ—হঠাৎ-কিছু নয়। একথা ঠিক—এ আন্দোলন সরাসরি সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাবে না—শুধু প্রভাবিত করবে তার উপরিকাঠামোকে। মনে রাখতে হবে, উপরিকাঠামোর ইতিবাচক পরিবর্তনসমূহ কাঠামো পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে সাহায্যই করে থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই 'গণবিজ্ঞান আন্দোলন'—সংক্রান্ত লেখাটি আমরা এ সংখ্যায় প্রকাশ করছি—যা কাজ শুরুর সূচনা মাত্র। আধুনিক জীবন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে কিছু চমকপ্রদ ও বিতর্কিত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই এখন পর্য্যন্ত যা অবস্থা তাতে শুধুমাত্র যুক্তিনির্ভর হয়ে ব্যাপারগুলো সম্পর্কে কোন স্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছনো যাচ্ছে না। বিজ্ঞান আন্দোলনের সাধারণ দিশা, ধারা ও বিজ্ঞান আন্দোলনে নীতিবোধের ভূমিকার প্রশ্নটির সাথেও অনেক সময় বিষয়গুলোর যোগাযোগ থাকছে। প্রকাশিত মূল অপর প্রবন্ধটি জীবন বিজ্ঞানের এই জটিল পরিস্থিতিকে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্য্যালোচনার একটি প্রাথমিক প্রয়াস মাত্র।

পরিশেষে সবিনয়ে দুটি কথা। প্রথমত, যে কোন ক্ষেত্রে বা পর্য্যায়েই আন্দোলনের কতগুলো সুনির্দ্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকবেই। তবু সামাজিক আন্দোলনের মূলস্রোতের সঙ্গে তাকে যুক্ত করা ও সামগ্রিক আন্দোলনের মধ্যে তাকে অঙ্গীভূত করা সব সময়ই প্রয়োজন। গণবিজ্ঞান আন্দোলনের ক্ষেত্রেও একথা সমান প্রযোজ্য।

ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিট্যুট অফ এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিন (যাদবপুর) এর কর্মী শ্রীজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা গভীর শোকাহত। তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার উৎসাহী সদস্য ছিলেন।

বিজ্ঞান আন্দোলনের সন্ধানে

[The essentially social character of scientific activity is underlined and contrasted with the state of science in Indian society. The necessity of an all-out movement for linking up science with society is emphasised. Suggestions are put forward as to the aims and objectives and the possible mode of building up such a science movement.]

জীবজগতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম কারণ হল মানুষ সামাজিক। বিক্ষিপ্ত ও ব্যক্তির আবেগ-নির্ভর ক্রিয়াকলাপের সচেতন ও সমষ্টিগত রূপান্তরের তাৎপর্য অপরিসীম। কারণ, সেই থেকে যাত্রা শুরু বিজ্ঞানেরও। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি তাই সামাজিক প্রগতিরই নামান্তর।

-কিন্তু সমাজে শ্রেণীবিভাগের ফলে বার বার একশ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্য শ্রেণীর উপর চেপেছে শোষণ ও অত্যাচার। বিজ্ঞান, যা কিনা একটি সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড, তাকে শোষকরা যুগে যুগে করতে চেয়েছে তাদের হাতিয়ার। অবরুদ্ধ হতে বসেছে সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি। আবার তাকে প্রগতির পথে চালিত করতে প্রয়োজন হয়েছে দীর্ঘ সংগ্রামের। সে সংগ্রাম মানুষের আর তাদেরই সাথে সাথে সচেতন ও সত্যাশ্রয়ী বিজ্ঞানীদের।...প্রাচীন গ্রীস-রোমের দাসতন্ত্রের উচ্ছেদে থেলস (Thales), অ্যানাক্সিমেন্দার ডেমোক্রিটাস প্রমুখ বিজ্ঞানীদের পরোক্ষ অবদান নিতান্ত কম নয়।[1] অনতি-অতীতে আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মকালে, চার্চতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার প্রয়োজন হয়েছিল কোপারনিকাস-গ্যালিলিওদের, ধর্মধ্বজীদের আগুনে ব্রুনোকে করতে হয়েছিল দধিচীর মৃত্যুবরণ।[2] কিন্তু তখন কে জানত যে কয়েকটা শতাব্দীর ব্যবধানে নব্য বিজ্ঞানে বলীয়ান হয়ে একদা শোষিতরাই আবার নেবে শোষকের ভূমিকা? বিজ্ঞানের সহায়তায় মানুষকে যন্ত্রের দাসে পরিণত করে জমাবে মুনাফার পাহাড়? আঠার-উনিশ শতকের সমৃদ্ধির পীঠস্থান নব্য ইউরোপে বিজ্ঞান তাই আবার হতে বসেছে একটি মহিমান্বিত, অ-লৌকিক ক্রিয়া, একটি শ্রেণীর তোষামোদে বিগলিত, বিজ্ঞানীকুল সেবাদাস। ক্বচিৎ ছিটকে এসে পড়া বাউণ্ডুলে ফ্যারাডে, কপর্দকহীন মেন্দলেয়ভরা বিজ্ঞানকে মানুষের কল্যাণে নিয়োগ করার প্রয়াস পান, পাভলভরা মুখোশধারী বিজ্ঞানীদের মুখোশ দেন খুলে,[3] বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা কিশোরী-কুরী বিশ্বখ্যাতা মাদাম কুরী হয়েও নিপীড়িত মানুষের মুক্তির কথা ভেবে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে স্বাগত জানান।[4] তাঁদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিজ্ঞানকে মুনাফালোভীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি না হতে দিতে, যুদ্ধবাজদের মারণাস্ত্রের যোগানদার না হতে দিতে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন ফ্রেডারিক ও আইরিন জোলিও কুরী[5], এগিয়ে আসেন বার্ণাল, নীডহ্যাম, হ্যালডেনরা।[6] আইনষ্টাইনকে দেখা যায় নিপীড়িত মানবতার পক্ষ নিয়ে সমাজতন্ত্রের পক্ষে প্রচার চালাতে।[7] বিজ্ঞানের শ্রেণী (অপ) ব্যবহারের বিরুদ্ধে আন্দোলন বিজ্ঞানের ইতিহাসের অপরিহার্য অঙ্গ। যত দিন গেছে, ততই বিজ্ঞানীরা বেশী বেশী সংখ্যায় সচেতনভাবে এগিয়ে এসেছেন নিপীড়িত শ্রেণীর কাছে।

ভারতবর্ষেও একদা সামাজিক প্রগতি ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি হাত ধরাধরি করে চলেছিল। চার্বাক কিংবা গৌতম বুদ্ধের প্রভাবে ভারত সাময়িকভাবে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের চর্চার প্রয়াস পেলেও[8] মনু পরাশররা শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় সংস্কারের শৃঙ্খলে ভারতীয় জনগণের হাত-পা-মুখ বেঁধে রাখতে সমর্থ হন। ফলে বার বার আছড়ে পড়েছে পরাধীনতার ঢেউ।...আজ আমরা অবশ্য 'স্বাধীন', পাশ্চাত্যের প্রগতিতে বিজ্ঞানের প্রভাব আমাদের মুগ্ধ করেছে। আমরাও বিজ্ঞানকে করতে চাই আমাদের প্রগতির হাতিয়ার।

...কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারত আজ আইবুড়ো কালিদাস। যে মাটি থেকে আমরা রস গ্রহণ করি, যে হাওয়ায় নিশ্বাস নিই, যে মানুষদের শ্রমার্জিত উৎপাদনে আমাদের আহার-বিহার—আমাদের বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপের কুঠার তারই গোড়া কাটতে সচেষ্ট। আমরা বিজ্ঞান শিক্ষা নকল করি, ফলে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত যুবশক্তি রপ্তানী করি,[9] যা নিজেরা করতে পারি তার জন্য বহু কাঠ-খড় পুড়িয়ে বহু অর্থব্যয় করে লোক-লস্কর, পদ্ধতি আমদানী করি, আর যা পারিনা তাই করার ফাঁপা প্রচেষ্টা চালিয়ে বিশ্ববাসীকে তাক লাগাই![10] অথচ আমাদের করায়ত্ত নয় সেই বিজ্ঞান যা মেটাতে পারে দেশের মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজনটুকু—পেটভরা রুটি, একটুকরো কাপড়, একটু আশ্রয় আর চিকিৎসা! আমাদের বিজ্ঞান কি এতই বন্ধ্যা, বিজ্ঞানীরা এমনি ক্লীব?

ভারতীয় বিজ্ঞানের যেসব অন্যতম 'মৌল বৈশিষ্ট্য' তা স্বভাবতই একশ্রেণীর ভারতবাসীর স্বার্থের খুবই অনুকূল, যদিও ব্যাপক মানুষের সীমাহীন দুর্দশার পটভূমিতে প্রয়োজন ঐসব 'মৌল বৈশিষ্ট্য'কে ধ্বংস করা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এইসব বৈশিষ্ট্যগুলি হল—মানুষের কৃষ্টি ও সৃষ্টিকে উপেক্ষা করা, যুবশক্তিকে আদর্শহীন ও পথভ্রষ্ট করা এবং নির্বিচারী পরনির্ভরতার পাকে জড়ানো। ফলে বিজ্ঞানকর্মীরা সমাজ ও মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন, আত্মবিশ্বাসহীন, হতাশাগ্রস্ত ও সংস্কারবদ্ধ। অন্যদিকে দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের মধ্যে অর্থ ও ক্ষমতা-লিপ্সা, কলহমুখরতা এবং স্বৈরাচারিতার মনোভাব প্রকট।[11] ভারতের বিজ্ঞাননীতি তাঁদের কোন শুভ আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে পারেনি।...

আমরা প্রায় সকলেই স্বীকার করি যে এরকম হওয়া উচিত নয়। সুতরাং আমরা এও স্বীকার করতে বাধ্য যে দেশকে স্বনির্ভর হবার লক্ষ্যে প্রত্যয়ী হবার জন্য; দেশবাসীর সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতির নিশ্চয়তার জন্য এবং সর্বোপরি ভারতীয় বিজ্ঞানের সৃষ্টিশীলতার অবরুদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন এদেশের বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার গতিমুখ পরিবর্তন। আর তা যেহেতু সম্ভব হয়ে উঠবে না যদি না বিজ্ঞানকে সুবিধাভোগী একাংশের কুক্ষিমুক্ত করা যায়, যদি না উৎপাদনের উপকরণাদি হয়ে ওঠে সামগ্রিকভাবে দেশবাসীর সামাজিক সম্পত্তি, তাই বিজ্ঞানের গতিমুখ পরিবর্তনের পন্থা নির্ণীত হবার জন্য প্রয়োজন একটি সচেতন আন্দোলন। চাই একটি বলিষ্ঠ ও আত্মপ্রত্যয়শীল বিজ্ঞান আন্দোলন।

ভারতের নিপীড়িত জনগণের কাছে স্বাধীনতা কোন সুফল নিয়ে আসেনি। তাদের জীবনে সুখ-সমৃদ্ধির আশা মরীচিকায় পর্যবসিত হতে বসেছে। কিন্তু সেটাই শেষ ও একমাত্র কথা নয়। তাদের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য সমাজের আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যেও তো চলেছে নিরবচ্ছিন্ন এক সংগ্রাম। বিজ্ঞানকর্মীরা কি যথোপযুক্ত একটি বিজ্ঞান আন্দোলনের মাধ্যমে সেই বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনের সহায়ক ভূমিকা নেবে, নাকি যুগ যুগ ধরে তারা সুবিধাবাদ ও বৈকল্যের শিকার হয়েই থাকবে—আজ অথবা আগামীকাল তাদের সে প্রশ্নের উত্তর দিতে এগিয়ে আসতেই হবে।...তবে 'কালে'র প্রতীক্ষা অনেক ক্ষেত্রেই দায়িত্ব এড়ানোর অজুহাত মাত্র।

কোন লক্ষ্যে ?

সামগ্রিকভাবে এবং ঐতিহাসিক বিচারে যদিও বিজ্ঞানের গতিমুখ পরিবর্তনই লক্ষ্য হিসেবে পরিগণিত হতে পারে, তবুও আন্দোলন দানা বাঁধবার জন্য লক্ষ্যগুলি আরও স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। আপাতত দুটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রাখার কথা বিবেচনা করা যায়ঃ

(১) বিজ্ঞানী-বিজ্ঞানকর্মী ও দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যের বর্তমান বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে উঠে একটি সংযোগ সেতু গড়ে তোলা যাতে পারস্পরিক আস্থা ও প্রত্যয়ের ভিত গড়ে ওঠে।

(২) যথেচ্ছ আমদানীর সরকারী নীতি তথা বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর চাহিদার বিপরীতে দেশীয় শিল্প, দেশীয় বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস চালানো।

পদ্ধতি কি হতে পারে ?

অনেকেই হয়তো মনে মনে ভাবছেন 'বিজ্ঞান আন্দোলন সে তো ভাল কথা, কিন্তু তার পদ্ধতিগত স্বরূপটি কি ?' খুবই সঙ্গত প্রশ্ন এবং স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে উত্তরটা প্রায় অজানাই। সত্যি বলতে কি, কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি বাতলানো কঠিন এবং হয়তো অনুচিতও। কাজে নেমে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই পদ্ধতি খুঁজে নিতে হবে ঠিকই, তবুও 'কাজে নামা'-র ক্ষেত্রটা ঠিক করে নিতে হবে বৈকি।

শুরু করার জন্য মনে হয়, স্কুল-কলেজ, বিজ্ঞান-ক্লাব ইত্যাদির মাধ্যমে বিজ্ঞানশিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, আবহাওয়া, চাষবাস প্রভৃতি বিষয়ের সুনির্দিষ্ট অংশবিশেষকে কেন্দ্র করে প্রধানত স্লাইড সহযোগে আলোচনা ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত করা ; বিজ্ঞান ক্লাব, লাইব্রেরী ইত্যাদি গড়ে তোলায় কার্যকরী সহযোগিতার হাত বাড়ানো, বৈজ্ঞানিক-সামাজিক ব্যাপারে ছোটখাটো সমীক্ষা চালানো—এসব কাজের ভিতর দিয়ে বিজ্ঞানকর্মী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সংযোগ গড়ে তোলার চেষ্টা করা সম্ভব।

সংস্থার নবগঠিত 'বিজ্ঞান আন্দোলন উপসমিতি' পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে তোলার প্রাথমিক বাস্তব পদক্ষেপ হিসাবে স্লাইড-সহযোগে বক্তৃতার কয়েকটি কর্মসূচী—দৈনন্দিন জীবনে বলবিদ্যা, বন্যা, প্রকৃতি থেকে সমাজ, জল ইত্যাদি গ্রহণ করছে। সংস্থার সদস্যদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে কোনো কর্মসূচী ও পরামর্শ থাকলে উপসমিতির সাথে যোগাযোগ করতে আহ্বান করা হচ্ছে।

সৌমেন গুহ
আহ্বায়ক, বিজ্ঞান আন্দোলন উপসমিতি

বিজ্ঞান আন্দোলন-প্রয়াসীদের অবশ্যই একটি নিরপেক্ষ, নির্ভীক ও তথ্যপূর্ণ বিশ্লেষণ করতে হবে যাতে প্রচলিত বিজ্ঞান শিক্ষা, গবেষণা ও প্রয়োগের ত্রুটিগুলিকে সঠিকভাবে সনাক্ত ও ব্যাখ্যা করা যায় এবং আন্তরিক ও সৎ প্রচেষ্টাগুলিকে তুলে ধরা যায়।

তরুণ বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর কাছে তার শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও লক্ষ্য সম্পর্কে একটা জিজ্ঞাসা গড়ে তোলার প্রয়াসও কর্মসূচীর একটি অন্যতম অঙ্গ হতে পারে।

বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গড়ে ওঠার অনুকূল সাহিত্যের সৃষ্টি বা প্রচার, যৌথভাবে সেগুলির পঠন ও আলোচনা এবং বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানীর জীবনী বা উপযুক্ত সাহিত্যের নাট্যাভিনয় বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হবে তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

সাধারণভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠুক এটাই যেহেতু কাম্য, ঘটা করে শুরুতেই "জনগণের কুসংস্কার" দূর করার কোন প্রয়াসের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

আন্দোলনের সম্ভাব্য কুশীলব :

ভারতবর্ষে ইতিমধ্যেই এ প্রশ্ন বহুবার উচ্চারিত হয়েছে এবং হচ্ছে যে বিজ্ঞানচর্চা কি জন্য ও কাদের জন্য ?[12] যিনিই এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চান আন্তরিকভাবে, তা তিনি প্রথাগত বিজ্ঞানচর্চা করুন আর নাই করুন, তিনিই হতে পারেন এ আন্দোলনেয় অংশীদার। তবে মূলতঃ বিভিন্ন স্তরের বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানকর্মী, শিক্ষার্থী, শিক্ষক গবেষকরাই হবেন আন্দোলনের কুশীলব। বিজ্ঞান ক্লাব বা ঐ জাতীয় স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উদ্যোগীরা এ ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারেন।...বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীরা এবং দেশীয় কারিগরি নির্ভর ছোট শিল্পের উদ্যোক্তারা পালন করতে পারেন গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা। কারণ ভারতীয় বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন তাঁদের রুটি-রুজির প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত।

ভারত বিজ্ঞানকর্মীদের আন্দোলনের সঙ্গে অপরিচিত নয়। স্বাধীনতালাভের আগে-পরে তার সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।[13] কিন্তু দেশের বিজ্ঞানচর্চার সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে ওঠার সুনির্দিষ্ট কোন লক্ষ্যে তা কোনদিন পরিচালিত হতে পারেনি। ঐতিহাসিক-ভাবেই এখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এই আন্দোলনকে নতুনতর পর্যায়ে উন্নীত করার।

বিজ্ঞান ক্লাবের ভূমিকা :

স্বাধীনতাউত্তর পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষত ষাটের দশকের পর, অন্তত-পক্ষে শতাধিক বিজ্ঞানক্লাব গড়ে উঠেছে—এটি বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ।[14] যদিও এ ক্লাবগুলির অধিকাংশই সক্রিয় নয় এবং কখনও কখনও লক্ষ্যহীন, তবুও কয়েকটি বিজ্ঞানক্লাবের প্রয়াস প্রশংসনীয়। বিজ্ঞান আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে এইসব বিজ্ঞানক্লাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ক্লাবগুলিকে সারা বছর সক্রিয় রাখার জন্য এবং বিজ্ঞান আন্দোলনের লক্ষ্যে উজ্জীবিত করার জন্য যৌথভাবে আলোচনা বিতর্কাদি অনুষ্ঠিত করা ছাড়াও স্থানীয় ভিত্তিতে নানারকম সমীক্ষা ইত্যাদি করা যেতে পারে।...এসব ক্লাবের মাধ্যমে জনগণের বিজ্ঞানচর্চার দিকটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এধরনের প্রচেষ্টা আছে কি ?

অবশ্যই আছে। গত প্রায় এক দশক ধরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে "জনমুখী বিজ্ঞান"-এর লক্ষ্যে বহু উল্লেখযোগ্য কাজকর্ম হয়েছে এবং হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় কেরলের কথা। কেরলের শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ "জনগণের বিজ্ঞান আন্দোলনে" অনেকখানি সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে। নভেম্বর ১৯৭৮-এ ত্রিবান্দ্রমে পরিষদ একটি সর্বভারতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে এধরনের বেসরকারী উদ্যোগগুলি থেকে অভিজ্ঞতা আহরণের এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কর্মীদের প্রেরণা ও উৎসাহ দেবার প্রয়াস পেয়েছে। কেরল ছাড়া, বোম্বাই, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উত্তর প্রদেশ, দিল্লী, কর্ণাটক প্রভৃতি রাজ্যে এক বা একাধিক ছোট বড় গোষ্ঠী বেশ নিষ্ঠার সঙ্গেই কাজকর্ম চালাচ্ছেন।[15] কিন্তু দুঃখের কথা কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া দেশের পেশাদার বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মীরা এ প্রয়াসের অংশীদার তো ননই, বরং তাঁরা এধরনের জনমুখী বিজ্ঞানচর্চার বিরোধী।

বিজ্ঞান আন্দোলন বনাম বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ :

পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কথা অনেকদিন ধরেই বলা হচ্ছে এবং সেজন্য বেশ কিছু সেমিনার, সিম্পোসিয়াম, বক্তৃতা ইত্যাদি যেমন হয়েছে, তেমনি নামী দামী বিজ্ঞানীরা বাংলায় দু-একটি প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমেও বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু এরই ফলে বিজ্ঞান যে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এমন দাবী বোধহয় কেউ করতে পারেন না। তাই প্রস্তাবিত 'বিজ্ঞান-আন্দোলন' নিছক জনপ্রিয়করণের জন্য নয়, আবার তাকে বাদ দিয়েও নয়। বস্তুত সঠিক পথে পরিচালিত বিজ্ঞান-আন্দোলনই বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার শ্রেষ্ঠতম পন্থা।

যথাযথ প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞান আন্দোলন :

যথাযথ প্রযুক্তিবিদ্যা বা অ্যাপ্রোপিয়েট টেকনোলজি নিয়ে হৈ চৈ চলছে কিছুদিন ধরে। বলা হচ্ছে ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে সেই কারিগরীই হবে সবচেয়ে উপযুক্ত যা দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসম্পদকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে পারবে। সর্বাধুনিক কারিগরী যা বহু ক্ষেত্রেই স্বয়ংক্রিয়ও, আমদানী করে ভারতের বিজ্ঞান ও শিল্প তথা অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। খুবই ভালো কথা এবং আশার কথাও। কিন্তু বাস্তব প্রচেষ্টার যে ধরণ-ধারণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাতে এমন মনে হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে যে অ্যাপ্রোপিয়েট টেকনোলজি সম্পর্কে আমাদের কোন সুনির্দিষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে নি। বহু ক্ষেত্রেই একে ছোট আকারের শিল্প গড়ার কারিগরী বলে ভাবা হচ্ছে—যা এমনকি আমদানীও অনায়াসে করা যায়। অন্য অনেক

ক্ষেত্রে আবার প্রচেষ্টা চলছে যাতে প্রচলিত গবেষণাগারগুলো থেকে প্রোজেক্টের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ 'যথাযথ কারিগরী' বেরিয়ে আসে। ...ব্যাপক বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মীদের কাছে এটি এখনও হাসি-ঠাট্টার বিষয়ই হয়ে রয়েছে।

১৯৭৭-এর ডিসেম্বরে ওয়াশিংটনে আয়োজিত এক আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে বলা হয়েছে—"সম্পত্তি ও ক্ষমতার বণ্টনের পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যেতে যদি সাহায্য করে তবেই প্রযুক্তিবিদ্যাকে যথাযথ বলে বিবেচনা করা যায়।" অন্যভাবে তাহলে নিশ্চয় বলা যায় উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যাবার অনুকূল প্রযুক্তিবিদ্যাই হবে যথাযথ। আর তা হ'তে হ'লে—যথাযথ প্রযুক্তিবিদ্যা শুধুমাত্র 'শিক্ষিত' বিজ্ঞানীদের মস্তিষ্কের ব্যায়াম কিংবা ল্যাবরেটারির মডেল পরীক্ষা থেকে উদ্ভূত হবে—এরকম ধারণা করা বাতুলতা মাত্র। বস্তুত, চাষী-কারিগর-কর্মী প্রভৃতি জনসাধারণের সক্রিয় অংশের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সচেতন ও সংবেদনশীল বিজ্ঞানীমনের মেলবন্ধনই হতে পারে যথাযথ প্রযুক্তিবিদ্যার সূতিকাগার। কোন বিজ্ঞান আন্দোলনই তাই যথাযথ প্রযুক্তিবিদ্যার বিষয়টিকে উপেক্ষা তো করতে পারেই না বরং তার উদ্ভাবন ও প্রয়োগের টেকনিক্যাল ও সামাজিক বাধাবিপত্তি দূর করাই হবে এ আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

উপসংহারের পরিবর্তে :

বর্তমান প্রবন্ধে যা বলার চেষ্টা করা গেল তা ভীষণভাবে অসম্পূর্ণ একটি বিজ্ঞান আন্দোলনের প্রস্তাবনা মাত্র। বিষয়টি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ অবিশেষজ্ঞ নির্বিশেষে একটা খোলা আলোচনার ক্ষেত্র উন্মুক্ত হোক এটাই কাম্য। তবে সবটুকু আগে বুঝে নিয়ে তবে কাজে হাত দেওয়ার মানসিকতাকে সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে যত তাড়াতাড়ি কাজে নামা যাবে তত তাড়াতাড়ি বিজ্ঞান আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা, লক্ষ্য, পদ্ধতি-প্রকরণ সঠিক ও সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হবে—লেখকের নিবেদন এটুকুই।

রবীন মজুমদার

সূত্র ও টীকা

1. থেলস ও অ্যানাক্সিমেন্দার—খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর গ্রীসের দার্শনিক ও বিজ্ঞানী। থেলস অ্যানাক্সিমেন্দারের শিক্ষক ছিলেন। তদানীন্তন ধারণার বিপরীতে তাঁরা মনে করতেন যে সূর্য ও চাঁদ পৃথিবীর মতই বাস্তব—বস্তু থেকেই তাদের উদ্ভব, ঈশ্বর সৃষ্ট নয়। 585 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের 28 মের সূর্যগ্রহণের বিষয়ে পূর্বঘোষণার দ্বারা থেলস তাঁর তত্ত্বের নির্ভুলতার প্রমাণ দেন। অ্যানাক্সিমেন্দারকে পৃথিবীর প্রথম বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের প্রণেতা বলা যায়। ডেমোক্রিটাস গ্রীসে প্রবাসী ছিলেন খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে। ঈশ্বরে ঘোর অবিশ্বাসী ও পরমাণুবাদের প্রবক্তা। ("Giants at the Crossroads" by M. Ilin & E. Segal—বইটি প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞানীদের এক অপূর্ব আলেখ্য। বাঙলায় এর অংশ বিশেষের জন্য "বীক্ষণ" ২য় বর্ষ, চতুর্থ মুদ্রণ দ্রষ্টব্য)।
2. নিকোলাস কোপারনিকাস, জিওর্দানো ব্রুনো ও গ্যালিলিও গ্যালিলেই—ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর এই তিন মহান বিজ্ঞানী যোদ্ধার কথা আজ আর অজানা নয়। পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ ঘোরে—এই ধারণার বিপরীতে সূর্যকেন্দ্রিক ব্রহ্মাণ্ডের ধারণার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও কোপারনিকাস তাঁর বই মুদ্রিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন জীবনের একেবারে অন্তিম লগ্নে। ব্রুনোকে এই ধারণা প্রচারের জন্য ধর্মধ্বজীদের আগুনে পুড়ে মরতে হয়েছিল, আর তারও পরে গ্যালিলিও জীবনসায়াহ্নে কাটিয়েছেন প্রায় নিঃসঙ্গ বন্দীদশা।
3. ইভান পেত্রোভিচ পাভলভ (1849-1936) প্রখ্যাত রুশ শারীর-তত্ত্ববিদ। মানুষের মস্তিষ্ক ও মননপ্রক্রিয়া বিষয়ে প্রথম সত্যি-কারের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রবক্তা। 'পাভলভ পরিচিতি'—ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বা 'প্রস্তুতিপর্ব'—মে '79 বাংলাভাষায় পাভলভ সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও রচনা।
4. তরুণী মারিয়া স্কলডোয়াস্কা কুরী, পরবর্তীকালের মেরী কুরী (1867-1934) গোপন বিপ্লবী কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। উদ্দেশ্য মাতৃভূমি পোল্যাণ্ডকে জারের কবলমুক্ত করা। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর কুরী দম্পতি তাকে স্বাগত জানান।
5. মেরী কুরীর কন্যা আইরিন কুরী এবং তাঁর স্বামী ফ্রেডারিক জোলিও কুরী—বিশ্ববিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের বিভীষিকার পটভূমিতে বিজ্ঞানকে শান্তি ও প্রগতির জন্য ব্যবহারের আন্দোলনে ওয়ার্লড ফেডারেশন অফ্ সায়েন্টিফিক ওয়ার্কার্সকে একটি কার্যকরী আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী সংগঠন হিসাবে গড়ে তোলায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন।
6. জে. ডি. বার্ণাল, জোসেফ নীডহ্যাম ও জে. বি. এস. হালডেন প্রমুখ ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা বিশ্ববাসীর কাছে চমৎকারভাবে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁদের মতে একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই বিজ্ঞানচর্চা ও

মানবকল্যাণে তার প্রয়োগের পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল। "Visible College"—P. G. Worsky (Allen Lane, 1978) এঁদের জীবন ও কর্মধারার একটি সুন্দর চিত্রণ।

7. অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের 'Why Socialism' শীর্ষক পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

8. চার্বাক ও তাঁর অনুগামীরাই ভারতে যুক্তিবিদ্যা ও তর্কবিদ্যার প্রবর্তক বলে অনুমান করা যায়। ঈশ্বর ও পরলোকে অবিশ্বাসী। প্রাচীন ভারতে যে সময়ে চার্বাক দর্শনের প্রভাব ছিল বলে অনুমান করা যায় সেই সময়কেই (খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম-চতুর্থ শতাব্দী) বিজ্ঞানচর্চার স্বর্ণযুগ বলে চিহ্নিত করা যায় (দ্রঃ বিজ্ঞানের ইতিহাস—সমরেন্দ্রনাথ সেন)—এটাকে নিছক কাকতালীয় বলে ভাবা ঠিক নয়। চার্বাক তথা লোকায়ত দর্শন মানুষকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংস্কারমুক্ত করার প্রয়াস পায়। চার্বাকের রচনাদি কিছুই পাওয়া যায় না। তাকে পুরোপুরি ধ্বংস করা হয় বলে অনুমান। শুধু চার্বাক দর্শনকে আক্রমণ করা হয়েছে এমন কিছু কিছু অংশ হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সংস্কারকদের লেখায় ছড়িয়ে আছে।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও চেতনার উন্মেষে—বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনেরও অপেক্ষাকৃত হিতকর প্রভাব পড়েছিল (দ্রঃ ভারতীয় দর্শন—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)।

9. CSIR প্রকাশিত Indians Abroad Register-এ (Technical Manpower Vol XXI No 1 Jan 1979) 1978 ডিসেম্বর পর্যন্ত নথিভুক্ত বিদেশে অবস্থানরত বিজ্ঞানীদের সংখ্যা প্রায় 11000, আসলে সংখ্যাটা অনেক অনেক বেশী। কারণ মুষ্টিমেয় কিছু বিজ্ঞানী যাঁরা ভারতে ফেরার আশা পোষণ করেন কেবলমাত্র তাঁরাই নাম নথিভুক্ত করান। "Indians in America" শীর্ষক একটি প্রবন্ধের (Span Sept '74) হিসাব অনুযায়ী একমাত্র আমেরিকাতেই প্রায় 50000 ভারতীয় বিজ্ঞানী আছেন।

10. দাঁতের মাজন, নরম পানীয়, ব্লেড, ছোট খাট প্রসাধনী, জুতো ইত্যাদি ক্ষেত্রেও আমরা বিদেশী কারিগরী আমদানী করেই চলেছি (দ্রঃ Dr. Atma Ram's N. C. S. T Address 29 Sept. 1977 ; Science Today, Feb. 1978) আর আর্যভট্ট কিংবা ভাস্কর কৃত্রিম উপগ্রহের উৎক্ষেপণে বিশ্বজুড়ে আমাদের জয়জয়াকার ধ্বনিত হয়েছে। স্মরণীয় যে উপগ্রহ দুটিকে রাশিয়ার মহাকাশ স্টেশন থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে (দ্রঃ 'মহাকাশে ভারত' 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' জুলাই-আগষ্ট 1979)

11. দেশের অপেক্ষাকৃত তরুণ জ্ঞবিনীরা অনেকসময়েই যথোপযুক্ত আর্থিক, মানসিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগসুবিধা ও উৎসাহ থেকে বঞ্চিত হন। জোসেফ এবং বিনোদশা'রা মৃত্যুবরণ করে তা প্রমাণ করে গেছেন। আজও সে অবস্থার জের সমানেই চলেছে। অথচ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদির মাধ্যমে নিজেদের দাবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা না করে খবরের কাগজে চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশের কৌশল জানা আছে এমন মস্তান বিজ্ঞানীরা বেশ জাঁকিয়ে সাম্রাজ্য চালাচ্ছেন।...অধিকাংশ স্বয়ংশাসিত বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থার কর্তৃপক্ষ অধস্তন কর্মচারীদের "প্রভু" এবং একই আইনে অন্যরা "ভৃত্য"। এরকম নিয়ম থাকার ফলে ঐসব প্রতিষ্ঠানের বহু কর্ণধার (দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁরাও 'বিজ্ঞানী') স্বৈরাচারী হবার সুযোগ পান। (দ্রঃ "Is this Martyrdom Necessary"—K. R. Bhattacharya, Science Today July 1972, কিংবা Bulletin of the Assocn. of Scientific Workers of India Sept. 1979, কিংবা "Warlords of Indian Science"—Science Today March 1979)

12. যেমন 'A Search for the Meaning of Science'—শীর্ষক প্রবন্ধ (by A.K. Roy Science Today Oct. 1979)

13. সংক্ষিপ্ত একটি আলোচনার জন্য 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'—সেপ্টেম্বর-অক্টোবর 1977 (১ম বর্ষ, ২য় সংকলন) দেখা যেতে পারে।

14. সম্প্রতি (আগষ্ট 1979) গোবরডাঙ্গা বিজ্ঞান ক্লাব আয়োজিত সর্বভারতীয় বিজ্ঞানক্লাব সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা দ্রষ্টব্য। প্রায় চল্লিশটি বিজ্ঞানক্লাবের কাজকর্ম ও সমস্যাদির রিপোর্ট সন্নিবেশিত হয়েছে।

15. "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী"র বিভিন্ন সংখ্যায় (জা-ফে, মে-জুন '79 ইত্যাদি) এধরণের কাজের কিছু কিছু রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে।

Science Today (Dec. '77, Jan. Oct. '79 ইত্যাদি) সংখ্যাগুলি দ্রষ্টব্য। ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, বোম্বাই থেকে অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয় 'Science Movement Newsletter'।

Introducing a Document to be Noted

প্রচলিত বিশ্বব্যবস্থায় বিজ্ঞানের অপব্যবহার ও বিকৃতির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগপত্রের প্রধান বক্তব্যগুলি আলোচিত হয়েছে। অভিযোগপত্রটি পুণার এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত ও 'পারমাণবিক বিজ্ঞানীদের বুলেটিনে' মুদ্রিত। অভিযোগপত্রে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা কিভাবে শোষণের স্বার্থে ব্যবহৃত হয় তার বাস্তব উদাহরণসহ যে বর্ণনা আছে তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হ'ল।

The Bulletin of the Atomic Scientists has recently published (January '79. p 57) an 'Indictment' against perversions of Science and Technology in the form of a statement issued at the 14th meeting of the World Order Models Projects (WOMP) held at Pune, India, July 2nd to 10th, 1978. The statement was signed by Saul Mendlovitz (Institute for World Order) and Rajni Kothari (Centre for the Study of Developing Societies) and was endorsed by 26 individuals associated with the project. It is worthwhile to present the salient features of the documents since it is a poignant statement of how science is being abused in the services of an unjust global order and an equally sharp reminder of the necessity for joint action on the part of scientific workers to mobilise protest against such abuse. The document was submitted to the various preparatory meetings of the U. N. Conference on Science and Technology for Development since held in August, 1979.

The document indignantly takes note of some facts which we are confronted with, e g.,

(a) outrageous schemes under the guise of "appropriate technology" to feed the Third World poor on algae and garbage while their food producing lands are usurped by transnational corporations and local elites to grow carnations and roses for the world's rich minority.

(b) biological farming in the Third World by pharmaceutical transnationals who engage in large-scale drug testing among poor populations and export blood from poor to rich societies.

(c) the banishment of a growing number of the First World poor from productive activity through increasingly capital-intensive technology manifested by shocking rates of unemployment.

(d) the employment of 50 per cent of all research scientists in the world in military R and D, a significant proportion of that number for developing the technology of mass destruction and repression.

The authors have cited cases in which the exploitation of the Third World countries can be clearly felt. The illustrations are :

(i) Traditional fishermen of South Asia are being forced out of their occupations by mechanized trawlers which catch shrimp and other marine delicacies for the well-nourished peoples of the industrial world. The indiscriminate fishing methods of the mechanized trawlers are leading to decline of fish stocks, and thus to a fall in protein consumption among those who have virtually no source of protein other than fish. And this is inspite of the evidence found that traditional fishing activities are economically defensible, ecologically sound, and employment generating.

(ii) To feed insatiable demands of the machines of the industrial nations and the equally insatiable desire for foreign exchange among the Third World

elites hungry for imported luxuries and armaments, large areas are being mined and undermined, forests destroyed, fields flooded, rivers silted, and farmers and tenants displaced from independent sources of income and livelihood.

(iii) In the name of earning foreign exchange through tourism, where millions need housing, scarce resources are being directed to construct ten and fifteen storey hotels.

(iv) By the same logic, "surplus" food and meat are being exported while children remain malnourished. Transnational corporations also contribute to infant mortality and disease by actively promoting "modern" bottle-feeding in place of "old-fashioned" breast-feeding.

(v) The compelling drive to sell products made possible by modern technology, regardless of whether they serve any real social need, necessitates colonization of the mind itself. High powered advertising is used to "hook" some of the most deprived people of the world on senseless consumer goods, so that a head of family may spend a large fraction of his earnings on Coca Cola while his children starve. The results of these exploitations have an indirect bearing on the life of the First and Second Worlds. The so-called "civilisation diseases"—mental illness, heart disease, cancer etc.—are becoming widespread in these countries.

The document gives at last a call for action in these words "We strongly urge that pressure be built from leading thinkers and scientists, grass roots movements and non-governmental organisations to see that the 1979 Conference on Science and Technology squarely faces the issues raised in this statement, accepts the need for a total reorientation of science and technology and initiates a process of moving towards a truly liberating role for them". Let us join our voices with theirs in championing this just call.

We earnestly draw the attention of our readers to this document and request them to read the original between the lines.

এস. ভট্টাচার্য

For all Electrical, Electronic Components and Equipments and any other odd items.

Please Contact

D. S. ENTERPRISES

52/9C, B. B. Ganguly Street (1st floor),
Calcutta-700 012

(We also supply Hydrogen, Nitrogen, Oxygen & other cylinders of various capacities, Silica & Quartz tubes of different sizes)

সমাজ ও জীবনবিজ্ঞান—কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন

[The interaction between biological sciences and social consciousness, especally the problem of ethics is discussed. Questions examined are—survival of the fittest and social Darwinism ; gene theory and I. Q. ; the Lysenko problem ; genetic engineering, cloning ; test tube babies and their impact on social ideas. The danger inherent in transplanting an idea wholesale from one branch of knowledge to another is pointed out.]

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে একটা অলিখিত শ্রেণী বিচার আছে—এই ব্রাহ্মণ্যবাদের উপরের তলায় থাকে গণিত শাস্ত্র তারপর একে একে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, জীববিদ্যা, মনোবিদ্যা এবং সর্ব শেষে আসে সমাজবিদ্যা।

এই জাতপাত বিচারের একটা ঐতিহাসিক কারণ আছে—আজ পর্যন্ত যে সামাজিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতি হয়েছে তার প্রায় সমস্ত সময় জুড়ে একটা দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে গেছে যা হ'ল মানসিক শ্রমকে দৈহিক শ্রমের থেকে আলাদা করার প্রয়াস ও তাদের বিপরীত মেরুতে নিয়ে গিয়ে এক আপাত চিরন্তন দ্বন্দ্বের আবর্তে ঠেলে ফেলা। এই কারণেই আমরা দেখি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ অবধি তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও তারপর, বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত বস্তুবাদিতা যতই মানুষের কাছে স্বচ্ছ হয়েছে, ততই প্রায়োগিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। আজ আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত যে বিজ্ঞানের এই দুই ধারা একে অন্যের পরিপূরক।

যন্ত্র বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিজ্ঞানের মধ্যে যে প্রায়োগিক বিজ্ঞানের নতুন রক্ত প্রবাহিত হয়েছে তাতে লাভবান হয়েছে সব শাখাই, তবে মানুষের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে বিভিন্ন বিষয়ের প্রভাব বিভিন্ন। সেই দিক থেকে বিচার করলে প্রথমেই যে শ্রেণীবিভাগের কথা বলা হয়েছে সেই বিষয়গুলি মোটামুটি উল্টোদিক থেকে সাজানো উচিত। অর্থাৎ প্রভাব সব থেকে কম গণিত শাস্ত্রের, সব থেকে বেশী সমাজ বিজ্ঞানের। এর কারণে সরল ভাবে বলা যায় বিজ্ঞানের যে শাখা যত বেশী বিমূর্ত তার সামাজিক তাৎপর্য তত কম। তবে সামাজিক তাৎপর্য মানেই সামাজিক প্রয়োজন নয়—কেউ যেন ভুল করে না ভেবে বসেন গণিত শাস্ত্রের গবেষণার প্রয়োজন নেই—বিক্ষিপ্ত ছড়ানো হাজারো তথ্যকে সুসংবদ্ধ করতে পারে গণিত শাস্ত্রই।

বিজ্ঞানের এই বিষয়গুলির মধ্যে জীববিদ্যার স্থানটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কারণ তার স্থান ঠিক মাঝামাঝি। অর্থাৎ তাকে সবসময় তত্ত্ব আর প্রয়োগের টানা পোড়েনে থাকতে হয়। সামাজিক ধ্যান-ধারণা তাই বারবার জীববিদ্যার চর্চার পথ রুদ্ধ করেছে বা খুলে দিয়েছে আবার তেমনি জীববিদ্যার বিভিন্ন সূত্র বা ধারণা একদিকে যেরকম মানুষের চিন্তার জগতে ঘটিয়েছে বিপ্লব অন্যদিকে সচেতন বা অচেতন ভাবে ভুল বিশ্লেষণ সামাজিক ভাবে ক্ষতিকর ধ্যান ধারণারও সৃষ্টি করেছে।

জীববিদ্যায় প্রথম সামাজিক প্রবেশ ঘটে ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের মধ্য দিয়ে। এই তত্ত্বের সামাজিক তাৎপর্য অনেকেই খুঁজেছেন। মার্কস এই তত্ত্বের মধ্যে সমাজবাদ, বিশেষ করে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রমাণ খুঁজে পেয়েছিলেন, এবং এর ঋণস্বরূপ Das Capital-এর ইংরাজী সংস্করণ ডারউইনের নামে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। ডারউইন অবশ্য বিনীত প্রত্যাখানে বলেন যে সমাজবাদ ও বিবর্তন তত্ত্বের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকা সম্ভব নয়। তবে গণ্ডগোল বাধে "প্রাকৃতিক নির্বাচন—যোগ্যতমের উর্দ্ধতন" নিয়ে। "প্রাকৃতিক নির্বাচন-যোগ্যতমের উর্দ্ধতন" তত্ত্ব মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হলে মানুষকে তত্ত্বগত ভাবে শ্রেণী বিভাজনের দিকে নিয়ে যাবে এবং এক শ্রেণীর দ্বারা অপর শ্রেণীর নিপীড়ণ তখন হবে স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। অর্থাৎ সামাজিক প্রগতি হচ্ছে সামাজিক সাধারণ গতির বিপরীত ধারা। অন্যদিকে বিবর্তন তত্ত্বের সহযোগী আবিষ্কারক এডসার রাসেল ওয়ালেস যিনি নিজে সমাজবাদী ছিলেন, তিনি বলেন যে, মানুষের দৈহিক মানসিক সামাজিক প্রগতির বেলায় "যোগ্যতমের উর্দ্ধতন" তত্ত্ব খাটে না। এঙ্গেলসের লেখাতেও "প্রাকৃতিক নির্বাচন, যোগ্যতমের উর্দ্ধতন" তত্ত্বের উপর আস্থার বদলে বরং একটু ঝোঁক পাওয়া যায় লামার্কীয় ধ্যান ধারণার পক্ষে (দ্রঃ এঙ্গেলস্ রচিত "The part played by labour in the transition from Ape to Man" প্রবন্ধ) এটা ছিল ভ্রান্ত পদক্ষেপ। একদিকে এই যেরকম ছিল সমাজবাদীদের বক্তব্য অন্যদিকে ছিলো প্রতিক্রিয়া-

শীলদের নর্তন-কুর্দন—তাদের কাছে ডারউইনের তত্ত্ব হয়ে উঠলো শোষণ কায়েম রাখবার হাতিয়ার। এই বিকৃতিই পরবর্তীকালে সামাজিক ধারউইনবাদ নামে আখ্যা পায়। আজকে আর ডারউইনের তত্ত্বের অপব্যাখ্যা নিয়ে বাদ বিসংবাদ নেই, বিজ্ঞানের কোন সূত্রের সামাজিকীকরণ যে ভুল তা সর্বজন স্বীকৃত। সব সূত্রের প্রয়োগেরই একটা বৈধ ক্ষেত্র আছে, সর্বব্যাপী সূত্রের ধারণা অবৈজ্ঞানিক, ভাববাদী দর্শনেরই এটি একটি অভিব্যক্তি। এক সূত্রকে তার বৈধ ক্ষেত্র থেকে টেনে অন্য ক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে লেনিন বলেছেন "Rectilinearity and one sidedness, woodenness and petrification, subjectivism and subjective blindness—*voila* the epistemological roots of idealism".

আজ যেমনি দ্বন্দ নেই বিবর্তন তত্ত্বের অপব্যাখ্যা নিয়ে, দ্বন্দ কিন্তু আছে বুদ্ধিবৃত্তির বংশগত তত্ত্ব নিয়ে। প্রশ্ন ওঠে মানুষের সাধারণ বুদ্ধি কতটা বংশগত আর কতটা সামাজিক প্রভাব সঞ্জাত। এই প্রশ্ন যে আজকে হঠাৎ উঠেছে তা নয়, বলা যেতে পারে এটি নতুন বোতলে পুরোনো মদ। হারবার্ট স্পেনসার ১৮৫১ খৃঃ তার "Social Statics"-এ লিখেছিলেনঃ "অক্ষমের দুঃখ দুর্দশা খুবই স্বাভাবিক, গরীবের অনাহারের মধ্যে আছে এক দূর দৃষ্টি সম্পন্ন কল্যাণময় শক্তির রূপ যা স্বাভাবিকভাবে সমাজ থেকে বিতাড়ণ করছে তার অস্বাস্থ্যকর, নিশ্চল মূল্যহীন বাসিন্দাদের"। চরম প্রতিক্রিয়াশীল এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে দর্শন লুকিয়ে আছে তা হলো "রাজরক্তের তত্ত্ব", অর্থাৎ জন্মই সব, বংশের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সব গুণপনা, সামাজিক অসাম্যের কারণ বংশগত অক্ষমতা। সামাজিক অসাম্যের এই বংশানুভিত্তিক ব্যাখ্যা স্পেনসার, গ্যালটনের হাত ঘুরে এসে শক্ত করেছে ফ্যাসিস্ত হিটলারের হাত, (ঈহুদি নিধন যজ্ঞের দার্শনিক 'ব্যাখ্যা') আর আজ শক্ত করছে পৃথিবীর নিপীড়িত, শোষিতের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের কালো হাত। তাই আজ জেনসন্-হেরেনষ্টাইন-আসেনইক-শকলের দল বলে বেড়াচ্ছে আমেরিকার কালোরা সাদাদের তুলনায় অল্পবুদ্ধি, তাদের দুঃখ দুর্দশার জন্য দায়ী তাদের জীন (gene), সামাজিক বৈষম্য নয়।

জীববিদ্যার জগতে জ্ঞানের বিস্ফোরণের ফলে অনেক তত্ত্ব অনেক খবরই আজ সাধারণ মানুষের নাগালে। এমনি এক তত্ত্ব জীন তত্ত্ব (gene theory)। মানুষের চোখ নীল হবে না খয়েরী, উচ্চতা, গায়ের রং, দৈহিক ছাঁচ—বৈচিত্র্যের হাজারো প্রশ্নের উত্তর আছে মানুষের কোষমধ্যস্থ বংশানুর (Chromosome) মধ্যে। তার মানে কখনই এই নয় যে কেউ গণিতে না সঙ্গীতে পারদর্শী হবে তাও থাকবে তার বংশানুতে।

অথচ এই সব বক্তারা এটাই বলছেন। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি যে তার পারিপার্শ্বিক সামাজিক অবস্থার ফলশ্রুতি, এই সত্য তাঁরা স্বেচ্ছায় ভুলেছেন, শোষণ কায়েম রাখার তত্ত্ব চালু রাখতে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই তত্ত্বের প্রচার চলছে বিজ্ঞানের নামে। সাদা ও কালোদের মধ্যে বুদ্ধ্যাঙ্কের (I. Q.) তফাৎ দেখাতে গিয়ে সামাজিক অবস্থার কথা এঁরা ভুলে যাচ্ছেন। অথচ এঁদের ভুল ধরতে গিয়ে দেখানো হয়েছে একই সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থায় বসবাসকারী সাদা ও কালোদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। বুদ্ধিবৃত্তির এই জেনেটিক অপব্যাখ্যা যে সাম্রাজ্যবাদী দেশে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পাবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ভারতবর্ষে এই প্রশ্ন ঠিক এইভাবে হয়ত নেই, তবে বিভিন্ন ধরনের প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়িক ধ্যান ধারণার মধ্যে যে সুপ্ত অবস্থায় "রাজরক্তের তত্ত্ব" কাজ করে চলেছে তাতে সন্দেহ নেই।

> The development in evolution of bipedalism (walking upright) produced a narrowing of the birth canal resulting in the birth of offspring which are smaller and less developed than other primates. Thus the overwhelming part of brain development of human infant occurs in culture, in interaction with other human beings rather than in the womb. And it is this quality of growth of infant in culture that makes human beings. Apart from this development in culture the infant does not become a human being.
>
> S. Washbirn—Tool and Human Evolution

বৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারণা কিভাবে সামাজিক চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করেছে, বিবর্তনবাদ ও বুদ্ধিবৃত্তির বংশগত তত্ত্বের ক্ষেত্রে আমরা তা দেখেছি, আবার সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় দর্শনও অনেক সময় বৈজ্ঞানিক গবেষণার বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এর এক উদাহরণ লাইসেংকোর মতবাদের ইতিহাস। প্রথমে এর বৈজ্ঞানিক পটভূমি নিয়ে আলোচনা করা যাক। জীবের কোষাশ্রিত বংশানুর আনবিক বিন্যাসের স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এই পরিবর্তন মূলতঃ অনিয়মিত, অর্থাৎ আগে থেকে নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয় কখন কি পরিবর্তন ঘটবে। এই পরিবর্তনকে মিউটেশন (Mutation) বলে। আজ মিউটেশন এর আণবিক কার্যকারণ সম্পর্ক যতটা পরিষ্কার তার প্রায় কিছুই জানা ছিল না ৩০-৪০ বছর আগে। প্রশ্ন তখন ছিল এই পরিবর্তন কতটা পারিপার্শ্বিক-নির্ভর, কতটা নয়। রাশিয়ায় (১৯৩০-৬০) এই প্রশ্ন এর সম্ভাব্য সামাজিক তাৎপর্যের দরুণ গুরুত্ব লাভ করে। যদিও অনিয়মিত

মিউটেশন-এর পক্ষে প্রমাণ ছিল রুশ বংশানুবিদদের হাতে, তবুও রাশিয়ার আণবিক জেনেটিক্স্ এর সৃজনশীল গবেষণা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে শুধু গবেষণার ক্ষেত্রেই যে তাঁরা পিছিয়ে পড়েন তাই নয়, কৃষিক্ষেত্রেও উৎপাদন মার খায়। অর্থাৎ "যোগ্যতমের উদ্বর্তন" তত্ত্বের সামাজিক তাৎপর্য আরোপ করতে গিয়ে যে ধরনের বিভ্রাট ঘটেছিল, এ ক্ষেত্রেও ঘটলো সে ধরনেরই প্রমাদ। সঠিক দিক্‌নির্ণয়ের জন্য তাই আমাদের বারবার ফিরে যেতে হবে লেনিনের পূর্বোল্লেখিত উদ্ধৃতিতে।

যদিও আমরা সব সময় দেখেছি জীববিদ্যার বিভিন্ন সূত্র ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন সময় ধরে সামাজিক ভিত্তি খুঁজেছে, তবুও এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ ন্যায়-নীতি অনেক সময়ই জীববিদ্যার বিভিন্ন গবেষণার দ্বারা প্রভাবিত হয়। এটা আজ যেরকম সত্য সেরকম আর কখনই ছিল না। এর কয়েকটা উদাহরণ পাওয়া যায়—জেনেটিক্ ইঞ্জিনিয়ারিং—টেস্টটিউব বেবি—ইচ্ছাকৃত অকাল গর্ভপাতে।

প্রথমে জেনেটিক ইন্‌জিনিয়ারিং-এর একটি আলোচনা করা যাক—আজ এটা সম্ভব হয়েছে একটি ইঁদুর বা ব্যাঙের চামড়ার কোষ থেকে একটি কোষ বের করে নিয়ে তাকে গবেষণাগারে গজিয়ে একই চেহারার কয়েক শো ব্যাঙ বা ইঁদুর তৈরি করা—এর জন্য যা প্রয়োজন তা হলো অতিসূক্ষ্ম শল্যক্রিয়া, অর্থাৎ একটি কোষের মধ্যে ফুটো করে আর একটি কোষের বংশানু ঢুকিয়ে দেওয়া। একটি কোষের মাপ যেখানে ১ সে. মি.-এর এক হাজার ভাগের এক ভাগ সেখানে এই কাজে সূক্ষ্মতা অনুমেয়। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এই পদ্ধতিকে ক্লোনিং (cloning) বলে। হয়ত ভবিষ্যতে মানুষের ক্ষেত্রেও এটা সম্ভব হবে (কিছুদিন পূর্বে বাঁদরের ক্ষেত্রেও সাফল্য অর্জন করা গেছে)। তবে মানুষের ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা হবে কি না তা নির্ভর করছে গবেষকদের ও রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধের উপর।

টেস্ট টিউব বেবির কথা সকলেই জানেন, কারণ কয়েক মাস আগেই এটা নিয়ে সারা বিশ্বে হৈ চৈ হয়েছিলো। গবেষণাগারে মাতৃগর্ভের নকল অবস্থা সৃষ্টি করে সেখানে প্রাণের সঞ্চার ঘটানো বৈজ্ঞানিকভাবে চমকপ্রদ হলেও এর ফলে সামাজিক ধ্যানধারণার উপর কী ধরণের প্রভাব পড়বে তার হিসাব এখনও হয় নি। তবে ভারত তথা তৃতীয় বিশ্বে যেখানে সাধারণ শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা সাধারণ মানুষের মধ্যে খুবই অল্প সেখানে মানুষ এই ধরণের ঘটনাকে বিজ্ঞানের অশুভ শক্তির প্রকাশ হিসাবেই নেবে। ধর্মীয় গোঁড়ামীর কথা বাদ দিলেও বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে যে নীতিবোধ গড়ে ওঠে তার সঠিক পরিপ্রেক্ষিত মানুষকে না বোঝানো হলে তা মনের উপর উল্টো ক্রিয়া করে। অবশ্য এই পদক্ষেপের বৈজ্ঞানিক মূল্য খাটো ক'রে দেখার কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

বংশানুর বিভিন্ন খুঁতের ফলে বিকৃত শিশু জন্মগ্রহণ করতে পারে। এই ধরনের শিশু সমাজের পক্ষে বোঝা স্বরূপ। আজ গবেষকরা কিছু কিছু খুঁত ধরতে পারেন শিশু গর্ভে মাস দুই থাকা কালেই। এর দ্বারা মা রাজী হলে স্বেচ্ছায় গর্ভপাত করতেও পারেন। তবে জেনেটিক ইন্‌জিনিয়ারিং-এর ব্যাপক অগ্রগতির ফলে ভবিষ্যতে বংশানুর খুঁত সংশোধনের উপায়ও হয়ত হবে।

সব মিলিয়ে বলা যায় মানুষের জন্ম, তার জীবন নিয়ে যে অতীন্দ্রিয়বাদী চিন্তাধারা ছিলো তা আস্তে আস্তে কাটছে। এতে যে সামাজিক ন্যায়-নীতিবোধ পাল্টাবে তাতে সন্দেহ নেই। এটা যে সাময়িক বিভ্রান্তি-বিচ্যুতি কাটিয়ে মোটের উপর সামাজিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে তা নিশ্চয় বলা যায়। তবে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও সামাজিক প্রগতির মধ্যে আপাত বিরোধগুলি মিটাবার জন্য অতীতের সমস্ত ভুলচুক থেকে সম্যক শিক্ষা নেওয়া একান্তই প্রয়োজন।

শান্তনু দত্ত

বিজ্ঞানকর্মী আন্দোলন সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গের স্বশাসিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহের ইউনিয়ন ও এ্যাসোসিয়েশনগুলির যুক্ত সংগ্রাম কমিটি (জ্যাকারি)'র নেতৃত্বে সাহা ইনষ্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের আন্দোলন কিছুটা সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে।

গত ১১ই আগষ্ট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা ভবনে ইনষ্টিটিউটের পরিচালন সমিতির বৈঠক বসে। এ উপলক্ষে জ্যাকারির পক্ষ থেকে ভবনের সামনে এক মৌন প্রতিবাদের আয়োজন করা হয়।

বৈঠক শুরু হলে জ্যাকারি এবং প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মী সংগঠনের পক্ষ থেকে পরিচালন সমিতির কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। যদিও কর্মীদের দাবীগুলো পুরোপুরি মেনে নেওয়া হয়নি কিন্তু বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালন সমিতি কয়েকটি উৎসাহব্যঞ্জক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। সিদ্ধান্তগুলি যথাক্রমে: ১) সাহা ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর ডি. এন. কুণ্ডু অপসারিত হবেন; ২) সমস্ত অধ্যাপক ও সহ অধ্যাপকদের নিয়ে এক পরামর্শদাতা কমিটি গঠিত হবে; ৩) অস্থায়ী ডিরেক্টর

কমিটির পরামর্শানুসারে দীর্ঘদিনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থাগুলি প্রত্যাহার করবেন, এবং ৪) স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে পরামর্শদাতা কমিটি ১৫দিন অন্তর আলোচনায় বসবে এবং তাদের সুপারিশগুলি পরিচালন সমিতির কাছে পাঠাবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে পরিচালন সমিতিতে রাজ্য সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা কর্মীদের ন্যায্য দাবীগুলির প্রতি সমর্থন জানিয়ে আসছেন।

সংঘবদ্ধ আন্দোলনের চাপে কলকাতার গুরুসদয় রোডে অবস্থিত বিড়লা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এ্যাণ্ড টেক্‌নোলজিক্যাল মিউজিয়াম (বি. আই. টি. এম.)'এর কর্তৃপক্ষকে সংস্থার কর্মীদের বিরুদ্ধে নেওয়া কয়েকটি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা গেছে।

গত জুলাই মাসে একজন ওয়াচম্যানকে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করা হয়। সংস্থার কর্মী সংগঠনের নেতৃত্বে কর্মীরা ঐক্যবদ্ধভাবে এ অন্যায় বরখাস্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। এরই ফলস্বরূপ কর্তৃপক্ষ আরও ৯জন কর্মীর বিরুদ্ধে সাসপেনশনের আদেশ জারী করে। এ সত্ত্বেও কর্মীদের মনোবল অটুট থাকে এবং এবং তারা আন্দোলন তীব্রতর করেন। 'জ্যাকারি' এবং অন্যান্য কয়েকটি ভ্রাতৃমূলক সংগঠন বি. আই. টি. এম.'এর কর্মীদের আন্দোলনের পাশে সামিল হয়।

এই পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ গত ১৪ই সেপ্টেম্বর সাসপেনশনের আদেশ বিনাশর্তে প্রত্যাহার করতে ও অন্যান্য দাবীর প্রশ্নে কর্মী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনায় বসতে রাজী হয়।

Federation of CSIR Employees & Works' Unions and Associations'এর সাধারণ সম্পাদক এবং চণ্ডীগড়স্থিত CSIO'র কর্মী হরিমোহনকে গত ২০শে সেপ্টেম্বর অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। এর কয়েকদিন পর দেরাদুনের Indian Institute of Petroleum 'এর কর্মী সংগঠনের সভাপতি আর. কে. শর্মা (যিনি Federation 'এর প্রাক্তন সভাপতি) এবং সাধারণ সম্পাদক কে. ডি. শর্মাকেও অবৈধভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

CSIR তথা দেশের স্বশাসিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির শ্রমিক কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার মূলে কুঠারাঘাত করার উদ্দেশ্যেই এই স্বৈরাচারী ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হয়েছে বলে কর্মীরা মনে করেন। CSIR কর্তৃপক্ষের এ অপকৌশল প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে এবং বরখাস্ত নেতৃবৃন্দের পুনর্বহালের দাবীতে সংস্থার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা এক দেশব্যাপী আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করতে চলেছেন।

আমেদাবাদ থেকে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ যে সেখানকার পি. আর. এল.-এর কর্মীরা সংস্থার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এক আইনগত সাফল্যলাভ করতে সমর্থ হয়েছেন।

পি. আর. এল. কর্তৃপক্ষ গত ১৪ই আগস্ট থেকে সংস্থায় লক্-আউট ঘোষণা করে এবং কাজে ফিরিয়ে নেওয়ার পূর্বশর্ত হিসাবে কর্মীদের এক মুচলেকায় সই করতে বলে। এ মুচলেকার মাধ্যমে কর্মীদের সমস্ত রকম প্রতিবাদ করার অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কর্তৃপক্ষ এও হুমকী দেয় যে যারা ১৪ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে মুচলেকা দেবেন না তাদের স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করাও হতে পারে। কর্মীদের ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রায় ৯০টি পদ স্থানীয় সংবাদপত্রে বিকশিভ হয়।

১৩ই সেপ্টেম্বর পি. আর. এল. এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে গুজরাত হাইকোর্টে এক রিট্ আবেদন দাখিল করে মুচলেকার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হয়। হাইকোর্টে সেদিনই এক আদেশ জারী করে কর্তৃপক্ষকে কর্মীদের বরখাস্ত করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়।

এরপর রিট্ আবেদনের ওপর শুনানী চলে এবং সকল পক্ষের বক্তব্য শোনার পর ২৪শে সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট আরেকটি আদেশ জারী করে। এ আদেশে বলা হয়েছে যে যাঁরা মুচলেকায় স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেছেন তাঁদেরও কাজে ফিরিয়ে নিতে হবে।

উল্লেখ্য যে সংস্থায় কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন, লক্-আউট এবং মুচলেকার বৈধতা সম্পর্কিত বিরোধগুলি মীমাংসার জন্য এক শিল্প ট্রাইবুনালের কাছে পাঠানো হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত ট্রাইবুনালে বিষয়গুলির নিষ্পত্তি না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ কর্মীদের বিরুদ্ধে কোনরকম ব্যবস্থা নিতে পারবেন না। কর্মীরা এ তিনটে বিষয় ছাড়া অন্য যে কোন ব্যাপারে স্বাভাবিক ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে পারবেন।

আদালতের এই আদেশ নিঃসন্দেহে পি. আর. এল.-এর স্বৈরাচারী কর্তৃপক্ষের কাছে এক আঘাতস্বরূপ।

['জ্যাকারি'তে বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাপ্ত]

ভারতীয় শিশুদের অপুষ্টি ঃ ক্যালরী বনাম প্রোটিন

আমাদের দেশে এক থেকে পাঁচ বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে শতকরা ৭০ থেকে ৮০ জন প্রোটিন এবং ক্যালরীর অভাবজনিত অপুষ্টিতে ভুগে থাকে। প্রোটিনের অভাব আর ক্যালরীর অভাবের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে খাদ্যে এক ধরণের নির্দিষ্ট উপাদান (অর্থাৎ প্রোটিন) প্রয়োজনীয় মাত্রার চেয়ে কম থাকে আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সব রকম উপাদান মিলিয়ে খাদ্য থেকে পাওয়া মোট শক্তির (যা প্রকাশ করা হয় ক্যালরীতে) পরিমাণ থাকে প্রয়োজনের তুলনায় কম। প্রোটিন আর ক্যালরীর অভাবজনিত রোগে শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধা পায়, তারা অত্যন্ত রোগা ও দুর্বল হয়ে পড়ে। এই অভাব খুব বেশী হলে কোয়াশিয়রকর বা মারাসমুস রোগ দেখা দেয়। মারাসমুসের মূল কারণ ক্যালরীর অভাব (প্রোটিনের অভাব নয়) আর কোয়াশিয়রকর হয় ক্যালরী ও প্রোটিন দুয়েরই অভাবের দরুণ। মারাসমুসে হাত পা শুকিয়ে কাঠির মতো হ'য়ে যায়; আর কোয়াশিয়রকরে অতিশীর্ণতার সঙ্গে শরীরে জল জমে। আমাদের দেশে অন্তত ৩০ লক্ষ শিশু এই দুই রোগের কবলে; এর মধ্যে মারাসমুসে আক্রান্ত শিশুদের সংখ্যাই বেশী।

প্রশ্ন হ'লো, মূল সমস্যা কি—ক্যালরীর অভাব না প্রোটিনের অভাব? পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে (১ থেকে ৫ বছর বয়সের শিশুদের) শতকরা ৯২ জন ক্যালরীর অভাবে ভোগে, আর প্রোটিনের অভাবে ভোগে শতকরা ৩৫ জন। প্রোটিনের অভাবে যারা ভোগে তাদের সবারই ক্যালরীরও অভাব দেখা গেছে, কিন্তু ক্যালরীর অভাবে যারা ভোগে তাদের শতকরা ৬২ জনের ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য প্রোটিন ঘাটতি নেই। অর্থাৎ প্রাথমিক সমস্যা খাদ্যের ঘাটতি, খাদ্যের নির্দিষ্ট একটি উপাদানের (প্রোটিন) ঘাটতি তার পরের ধাপের সমস্যা। এদেশের শিশুদের অধিকাংশই প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য পায় না ঠিকই, কিন্তু চাল, গম বা জওয়ার যা তারা প্রধান খাদ্য হিসাবে খায় তা থেকে তাদের শরীর কিছু প্রোটিন পায় (সাধারণ লোকের মধ্যে যে ধারণা চালু আছে যে, এগুলি থেকে কিছু প্রোটিন পাওয়া যায় না, তা ভুল)। কিন্তু মুশকিল হয়, ক্যালরীর প্রচুর ঘাটতি থাকায় এই প্রোটিনটুকু শক্তি সরবরাহের কাজে ব্যয় হয়, প্রোটিনের স্বতন্ত্র প্রয়োজন মেটাতে পারে না। শিশুদের মোট খাদ্যের যোগান না বাড়িয়ে তাদের প্রোটিন ঘাটতি মেটানোর জন্য যদি বিদেশী খয়রাতিতে পাওয়া, বিদেশ থেকে কেনা বা প্রচুর অর্থ ব্যয় ক'রে দেশে উৎপন্ন করা প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার সরবরাহ করা হয় তবে তা হবে বিরাট অপচয় (অনেক দেশী-বিদেশী স্বার্থ শিশুদের প্রতি দরদ দেখিয়ে সরকারকে দিয়ে এই পরিকল্পনা নেওয়াতে চাইছে)। কারণ ঐ দামী প্রোটিন আদৌ প্রোটিন হিসাবে ব্যবহৃত না হ'য়ে ক্যালরী যোগানোর কাজে ব্যয় হবে। পরিবর্তে মূল জোর যদি দেওয়া হয় খাদ্য শস্যের উৎপাদন বাড়িয়ে শিশুদের প্রধান খাদ্যের পরিমাণটা বাড়ানোর দিকে তবে তাদের ক্যালরীর অভাবটা মিটবে, ঐ খাদ্য থেকে যতটুকু প্রোটিন পাওয়া যায় সেটুকু প্রোটিন হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে প্রোটিনের অভাব বেশ কিছুটা মেটাবে আর তার পরের ধাপে গোটা সমস্যাটাই সমাধান করার ক্ষেত্র তৈরী হবে। এই প্রথম ধাপটিকে অগ্রাহ্য করে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহের ওপর মূল জোর দিয়ে শিশুদের ক্যালরী আর প্রোটিনের অভাবজনিত সমস্যা সমাধানের কথা ভাবা অবাস্তব এবং দেশের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর।

প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবারের প্রয়োজন শিশুদের রয়েছে বৈকি। বাচ্চাদের ইস্কুলে ইস্কুলে কৌটোয় ভরা দুধ সরবরাহ করতে পারলে ভালই। কিন্তু আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের শপথ হবে শিশুরা বাড়ীতে দৈনন্দিন যে খাবার পায় তার পরিমাণটা বাড়ানো। অর্থাৎ খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ানো ও তার বণ্টনে বৈষম্য দূর করা।

['মেডিকো ফ্রেণ্ডস সার্কল' প্রকাশিত 'ইন সার্চ অফ ডায়াগনোসিস' (রোগনির্ণয়ের সন্ধানে) পুস্তিকায় কে. এস. জয়রাও এর 'দি মিথ অফ প্রোটিন গ্যাপ' প্রবন্ধ অনুসরণে লিখিত]

অভিজিৎ লাহিড়ী

With best compliments from :

BHARAT FRITZ WERNER PRIVATE LIMITED

8, INDIA EXCHANGE PLACE, CALCUTTA-700 001

Phone : 26-9334

MACHINE TOOLS MANUFACTURERS IN COLABORATION WITH

Messres **FRITZ WERNER WERKZEUGMACHINEN**

BERLIN, WEST GERMANY.

PRODUCT RANGE :

Knee Type Milling Machines—Vertical, Horizontal and Universal in size : 0, 1, 1·5 & 3

Hydro Copy Millers, Production Millers, Hand-operated Unit Heads, Universal Tool & Cutter Grinders with All Indigenous Accessories Readily Available. Hydro-Electrically Operated SPMs based on Unit Constructian. Prompt After Sales-Service.

Regd. Office : PEENYA, BANGALORE-560022

Other Branches : BOMBAY, MADRAS, NEW DELHI, HYDERABAD, COCHIN, POONA.

Space Donated By

TURNER AND TOOLS

15, GANESH CHANDRA AVENUE,
CALCUTTA-700 013

PHONE : 26-0838

Dealers of :

Wokshop & Special Purpose Machinery

চিঠিপত্র

সম্পাদক সমীপেষু,

বক্তব্য যদি হয় "ভারতে বর্তমান বিজ্ঞান ও শিল্প ব্যবস্থা" যদি তার ভূমিকায় বলা হয় শিল্পের বিকাশ ও বিজ্ঞানের বিকালের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্কই বক্তব্যের বিষয়বস্তু, আর যদি আলোচনার শেষে দেখা যায় ভারতের Political Economic History সম্পর্কে একটা সারাংশ বলা হল—তাহলে সিদ্ধান্ত একটাই হয় "কি বলতে চাই" সেটা, যিনি বলছেন তার কাছে পরিষ্কার নয়। আর তার নীট ফল হল একটা মূলতঃ Scientific magazine-এ একটা মূলতঃ Political বিষয়বস্তুর আমদানি।

আমি রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারীর মে-জুন '৭৯ সংখ্যার প্রবন্ধের কথা বলছি। ভারতে ইংরেজ আসার আগে পর্যন্ত শিল্প ও কৃষির বিকাশ ইংল্যাণ্ডের প্রাক্ শিল্প বিপ্লব অবস্থার কাছাকাছি ছিল। তারপর প্রথমে ইংরেজরা এবং পরে দেশীয় শাসকরা ইতিহাসের চাকাকে পিছনে ঠেলে বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে। এটা লেখকের বক্তব্য। এই বিষয়বস্তু যখন একটা রাজনৈতিক ম্যাগাজিনে লেখা হবে তখন approach যা হবে আর যখন একটা Scientific magazine-এ লেখা হবে তখন approach কি একই হবে? নিশ্চয়ই নয়। পরবর্তী ক্ষেত্রে বিজ্ঞান কর্মীর উৎসাহ প্রথমত এটা জানতে যে ইংরেজ আসার আগে পর্যন্ত শিল্প ও কৃষির বিকাশের তালে তালে আমাদের দেশে বিজ্ঞান কিভাবে বিকশিত হচ্ছিল এবং সেই বিকাশ কিভাবে শিল্প ও কৃষির উন্নতির কাজকে প্রভাবিত করছিল। এইভাবে peak development এর stage টা' কি? এরপর একজন বিজ্ঞানকর্মী জানতে চাইবে ইংরেজরা ভারতের শিল্প ও কৃষির distortion বা repression ঘটানোর পর তা বিজ্ঞানচর্চাকে কিভাবে প্রভাবিত করল। অর্থাৎ ভারতীয় বিজ্ঞানের বিকাশের স্বাভাবিক ধারা ও ইংরেজরা তাকে যে পথে চালাতে চাইলো তার বিরোধের স্বরূপটি কি? তার বদলে আমরা কি পেলাম? না ইংরেজ পরিচালিত বিজ্ঞান শিক্ষা সম্পর্কে ভাসা ভাসা মন্তব্য। অর্থাৎ শিল্প ও কৃষির স্বাভাবিক ও বাধাপ্রাপ্ত বিকাশের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় বিজ্ঞানের বিকাশের ঐতিহাসিক বিবর্তনের কোন ছবি আমরা পেলাম না—অথচ প্রবন্ধের মুখবন্ধ এই প্রত্যাশাই জাগিয়ে ছিল।

পরিশেষে অনেক অতিসরলীকৃত মন্তব্যের মধ্যে সবচেয়ে দৃষ্টিকটু মন্তব্যটির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করছিঃ সাজাহানের তাজমহল গড়া আর নিউটন আইনষ্টাইনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের তুলনা, সব বৈজ্ঞানিকই তার পূর্বসূরী বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষের প্রকৃতিকে বশে আনার সংগ্রামের কাছে ঋণী, তাই বলে সামন্ততান্ত্রিক সম্রাটের প্রেমের বিলাসের সাথে কি বৈজ্ঞানিকের প্রচেষ্টার তুলনা হয়? কাছাকাছি তুলনা চলে তাজমহলের Original designer-এর সাথে কোন বৈজ্ঞানিক innovation এর। Theory of Knowledge এবং role of individual in history—এ সম্পর্কে অতিসরলীকৃত ধারণা এক বিপজ্জনক নৈরাজ্যবাদী সংস্কৃতি।

এছাড়াও কারিগরী স্বাবলম্বনের যে রাস্তার কথা লেখক বলেছেন তাও অতি সরলীকৃত—ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার সাথে মেলে না। প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে পরনির্ভরতা এড়ানো আর জ্ঞানের সার্বজনীনতার ধারণার মধ্যে একটা সুস্থ এবং balanced মিলনের ধারণাই কাম্য।

পরিশেষে বলব প্রত্যক্ষ রাজনীতি শেখার অনেক পত্রিকা আছে। এই পত্রিকায় আমরা চাই বিজ্ঞান—অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সমাজের সাথে তার সম্পর্ক সম্পর্কে আলোচনা। আমরা চাইনা সমাজ, সমাজ ব্যবস্থা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, উৎপাদিকা শক্তির সাথে তার সম্পর্কের আলোচনা, প্রথমটি Science and Society, দ্বিতীয়টি Society and its Political Economy বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যাকে আলোচনায় প্রধান দিক (principal aspect) করলে পত্রিকার উদ্দেশ্যের সাথে তা অসঙ্গতিপূর্ণ হবে।

বুদ্ধদেব দত্ত
কলিকাতা

লেখকের উত্তর

পত্রলেখকের সর্বপ্রধান অভিযোগ হোল যে "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান কর্মী"র মত মূলত একটি Scientific magazine-এ আমি "ভারতে বর্তমান বিজ্ঞান ও শিল্প সমস্যা" (ব্যবস্থা নয়) প্রবন্ধটির মাধ্যমে রাজনীতির আমদানী করেছি। কিন্তু পত্র লেখকের কাছে বিরক্তিকর মনে হলেও এটাই সত্য যে শুধু ভারত কেন পৃথিবীর যে কোন দেশের বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি বা অবনতির মূল কারণগুলো সেই দেশের

রাজনীতি তথা অর্থনীতির মধ্যে নিহিত। কাজেই ঐ সমস্ত বিষয়ে কোন আলোচনাই রাজনীতি ও অর্থনীতিকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। ইতিহাসে দেখা যায় যে গুপ্ত যুগ বা তার সমসাময়িক কালে ভারতীয় বিজ্ঞান ও তার পরবর্তীকালে আরব্য বিজ্ঞান যথেষ্ট উন্নত ছিল, কিন্তু কালক্রমে এই সমস্ত বিজ্ঞান চর্চা স্তব্ধ হয়ে যায় এবং ইয়োরোপ বিজ্ঞান চর্চার পীঠস্থানে পরিণত হয়। এই ধরণের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো পত্রলেখক যদি রাজনীতি না এনে তথাকথিত ivory tower science (বিশুদ্ধ বিজ্ঞান -বলতে পত্রলেখক যা বোঝেন) নিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারেন তাহলে খুবই বাধিত হব।

বৃটিশ আসার আগে ভারতে শিল্প ও বিজ্ঞান উন্নতির কোন পর্যায়ে ছিল সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে সম্ভব ছিল না। তবে আলোচ্য প্রবন্ধে বিজ্ঞানের কোন শাখা কতটা উন্নত হয়েছিল তার চেয়ে বিজ্ঞান ও শিল্পের অগ্রগতির যে একটা সামাজিক ও অর্থনৈতিক জমি তৈরী হয়েছিল সেটাই প্রধান বক্তব্য ছিল। বৃটিশ সেই জমিটাকেই নষ্ট করেছে এবং বৃটিশ আসার পরে ভারতীয় বিজ্ঞানের নিজস্ব ধারা ও বৃটিশ কর্তৃক আরোপিত ধারার মধ্যেকার পার্থক্যটাকে একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যেতে পারে। ভারতীয় নিজস্ব ধারা এমন একজন বিজ্ঞানীর সঙ্গে তুলনীয় যিনি নিজের চাহিদা ও সম্বলের মধ্যে সামঞ্জস্য করে স্বাধীনভাবে গবেষণার বিষয়বস্তু ঠিক করেন। অপর পক্ষে বৃটিশ কর্তৃক আরোপিত ধারা দ্বিতীয় একজন বিজ্ঞানীর সঙ্গে তুলনীয় যিনি কোন সংস্থার research & development বিভাগে চাকুরী করেন।

কারিগরি স্বাবলম্বনের যে রাস্তার কথা বলেছি ভবিষ্যতে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা আছে বলে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলবো। জ্ঞান সার্বজনীন ঠিকই কিন্তু কারিগরি জ্ঞান সার্বজনীন নয়। কারিগরি স্বাবলম্বনের জন্য যে isolation-এর কথা বলেছি সেটা একটা অস্থায়ী (temporary) ব্যবস্থা যা বিপ্লবোত্তর রাশিয়া ও চীনে অনুসৃত হয়েছিল এবং তার ফলে জ্ঞানের সার্বজনীনতার সঙ্গে তার কোন বিরোধ সৃষ্টি হয়নি। প্রকৃতপক্ষে বৈদেশিক কারিগরি আমদানীর পিছনে যে কারণগুলো আমাদের দেখানো হয় একটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে তার সবটাই শিল্প মালিকদের মুনাফার সঙ্গে জড়িত এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থ তাতে নেই বললেই চলে। পক্ষান্তরে দেশের সাধারণ মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি বর্তমান দেশীয় কারিগরি জ্ঞান দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে মেটানো সম্ভব। কাজেই আমাদের আশু প্রয়োজন হোল বিদেশী জ্ঞানের নির্ভরতা থেকে ও শিল্প মালিকদের (দেশী ও বিদেশী) লালসার হাত থেকে দেশের মানুষকে মুক্ত করে দেশীয় জ্ঞান ও উপকরণের দ্বারা বেশীরভাগ মানুষের কাছে তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো পৌছে দেওয়া। এই ন্যূনতম প্রয়োজন মিটে গেলে যদি দেশের মানুষের স্বার্থে (শিল্প মালিকের মুনাফার স্বার্থে নয়) বিদেশী কারিগরি আনার প্রয়োজন দেখা যায় তবে নিশ্চয়ই তা আনতে হবে কারণ কোন জিনিস rediscover করার কোন অর্থ হয় না।

রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী
বিজ্ঞান কলেজ

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা :
(সাধারণ)— তিন টাকা
(সডাক)—সাড়ে চার টাকা

যোগাযোগের ঠিকানা :
সম্পাদক,
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
C/o ডি. এস. এণ্টারপ্রাইস
৫২/৯সি, বি. বি. গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০০১২

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে পার্থ সেন কর্তৃক সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সম্পাদক রবীন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রাকর প্রেস, ১০/১সি, মারহাট্টা ডিচ লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত।